# কাজী নজরুল ইসলামের বাংলা ঠুমরী

মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)*

**সারসংক্ষেপ:** বাংলা সংগীতশিল্পে নজরুল সংগীত অসামান্য সংযোজন। বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, নতুনত্ব, বিষয়বস্তু, ভাব – এ সবের সংমিশ্রণ এই সংগীতে এক নবপ্রাণ সঞ্চারিত করেছে। বাণী ও সুরের অসাধারণ সমন্বয়ে গঠিত কাজী নজরুলের গান মূলত সংগীতভাবপ্রধান। নজরুল সংগীতে সুরের বিচিত্রতা উল্লেখযোগ্য, তিনি তার গানে মার্চের কুচকাওয়াজের সুর ও ছন্দ থেকে শুরু করে রাগ সংগীত পর্যন্ত সকল ধারাকে সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। ঠুমরী রাগ সংগীতের ধারারই একটি বৈঠকী ভাবপ্রধান সংগীতাঙ্গন। কবি নজরুল ঠুমরীর সৌন্দর্যকে নানাভাবে বাংলা গানে ব্যবহার করেছেন, তার কিছু নির্দশন ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই এই উপস্থাপনা।

মধ্যযুগের মুসলিম রাজত্বকালের প্রায় ছয়শত বছর সংগীত একটি প্রিয় বিষয় হিসেবে চর্চিত হয়েছে। অবশ্য তখন রাজকীয় দরবারেই তা আবদ্ধ ছিল এবং শুধুমাত্র উচ্চতর সমাজের মনোরঞ্জক হয়েই বেঁচে ছিল সংগীত। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার ছোঁয়া ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিশেষভাবে সাড়া জাগায়। অতঃপর নবাবি ও রাজকীয় পরিমণ্ডল থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে সংগীত সর্বসাধারণ মানুষের কাছাকাছি চলে আসে।

মানুষ পৈতৃক সম্পত্তি যেমন আঁকড়ে ধরে ঠিক তেমনি সংগীতবিদ্যাকে সংরক্ষণের আগ্রহে কলবন্তগণ নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁরা নিভৃতে নিরলস চর্চা চালাতে থাকেন এবং নানা সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গান-বাজনা শুনিয়ে গুণী-জ্ঞানীদের আকৃষ্ট করে সমাজে একটি নবধারার জন্ম দিলেন উনিশ শতকেই। ফলে শুধু অর্থবানরা নয় এগিয়ে আসেন বিদ্যোৎসাহী এবং সংস্কৃতিঘেঁষা বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও। ফলে কলকাতা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষীদের কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে বহু রকমের সংগীত চর্চার পরিবেশ। উনবিংশ শতাব্দীতেই *বিষ্ণুপুর ঘরানার* পাশাপাশি

*সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.5

কলকাতায় বহু স্তরের ধ্রুপদ চর্চার নানা শিল্পী ও সমঝদার গড়ে ওঠে। এ সময় বিষ্ণুপুর, বানারস থেকে শিল্পীদের কলকাতায় যাতায়াত সহজ ও সুগম হয়, এবং সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় বেতিয়া, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বহু সেরা ধ্রুপদ গায়ককে বাংলায় পাওয়া যায় কিন্তু সে তুলনায় খেয়াল গাইয়ের সংখ্যা ছিল কম। ধ্রুপদের পরেই সেই যুগে টপ্পা গাওয়া হতো। এ কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গানে ধ্রুপদ ও টপ্পার প্রভাব বেশি, খেয়ালের প্রভাব নেই বললেই চলে। এই শতকের প্রথম থেকেই টপ্পা গানের প্রচার ও প্রসার বেশ জোরালোভাবে ঘটে।

মূলত বাংলায় বাংলা সংগীতের প্রচার এবং প্রসারের প্রথম সারিতে যারা আছেন তাদের নাম যথাক্রমে রামনিধি গুপ্ত (নিধি বাবু), শ্রীধর কথক, গোপাল ওড়িয়া, গিরিশচন্দ্র, রূপচাঁদ পক্ষী, মধুসূদন কিন্নর (মধুকান), যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৮৪-১৯১৪), কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৫), রাধামোহন সেন প্রমুখ। পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম পরিবারের রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন এবং নজরুল ইসলামের নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলায় (পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ) সংগীতের ধারাবাহিকতা এভাবেই বহমান থাকে। ধ্রুপদ, টপ্পার পর আসে খেয়াল, শেষের ধাপটি ঠুমরী। ঠুমরীকে সেমি ক্লাসিক্যাল বা লাইট ক্লাসিক্যালও বলা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে ঠুমরীর প্রচলন শুরু হয়। ঠুমরীর জন্মস্থান লক্ষ্ণৌ ও দিল্লির আশেপাশে বলে জানা যায়। লক্ষ্ণৌ থেকেই পরে জন্ম নেয় বেনারসী ঠুমরী যাকে অনেকে পূরবী ঠুমরী বলে থাকেন (লক্ষ্মী নারায়ণ, ১৯৭৫ : ১৩৪)। শোনা যায় আলী বক্স খাঁ, মন্নে খাঁ প্রমুখ খেয়াল গাইয়েরা ঠুমরীও গাইতেন। তবে কলকাতায় যারা ঠুমরী প্রচলিত করেন তাদের মধ্যে গণপৎ রাও এবং মৈজউদ্দীনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া শ্যামলাল মতী, পিয়ারা সাহেব, মোতী বাঈ, আচ্ছন বাঈ, জর্দন বাঈ, গহর বাঈ, মালকাজান এরা অনেকেই মৈজউদ্দিনের কাছে তালিম পেয়েছেন। ওস্তাদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর দানও অপরিসীম। ওস্তাদ গোলাম আলীর নামও স্বর্ণাক্ষরে রচিত। ঠুমরীর চলন এবং চরিত্র সম্পর্কে জানা যায় : 'ঠুমরী পরিবর্তনশীল, সব রকমের স্টাইল, সর রকমের সুন্দরতার মিশ্রণেই ওর বৈশিষ্ট্য, বিচিত্রতাই ওর প্রাণশক্তি।' (লক্ষ্মীনারায়ণ, ১৯৭৫ : ১৩৪) অর্থাৎ ঠুমরী পরিবেশনার জন্যে হতে হবে সৃষ্টিশীল উদ্ভাবক। নানা রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে, শৃঙ্গার ও করুণ রসের আবেদনকে কীভাবে ও কতভাবে পরিবেশন করা যায় তাই ঠুমরীর মূল লক্ষ্য। ঠুমরীতে দুটি তুক থাকে, কখনো কখনো তিন চারটি তুকও দেখা যায়।

দাদরা তালে নিবদ্ধ ঠুমরীকে দাদরা বলা হয় আবার অনেকে ঠুমরীও বলেন, ঠুমরী ও দাদরা একই ঘরে জন্ম নেওয়া দুই বোনের মতো। এদের চলার বৈশিষ্ট্য একই। অনেকটা ধ্রুপদ ও ধামারের মতো। ঠুমরী দেশীয়, মৈথিলী, উর্দু ও হিন্দি ভাষায় রচিত হয়। পাঞ্জাবি 'খাড্ডা' মিশিয়ে একে আরও শ্রীবর্ধন করা হয়। ঠুমরীরও ঘরানা রয়েছে যেমন – ক) লক্ষ্ণৌ ঘরানা খ) বেনারসী ঘরানা গ) বাংলা ঘরানা ঘ) পাঞ্জাব ঘরানা।

ক) লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রবর্তক ওয়াজেদ আলি খা ও কদর পিয়া।

খ) বেনারস ঘরানার প্রবর্তক ওস্তাদ মৈজউদ্দীন। এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য দাদরা ও লোকসংগীতের ব্যবহার।

গ) বাংলা ঘরানার প্রবর্তক গণপৎ রাও ও ওয়াজেদ আলি শাহ।

ঘ) পাঞ্জাব ঘরানার প্রবর্তক স্বর্গীয় বড়ে গওলাম আলি খাঁ। পাঞ্জাবি খড্ডা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। (লক্ষ্মী নারায়ণ, ১৯৭৫ : ১৩৫)।

সংগীতবিদদের মতে বর্তমান ঠুংরীর ধারাটির সূচনা হয়েছিল লক্ষ্ণৌর নবাবি দরবার থেকে। ইংরেজ রাজত্বকালে লর্ড ডালহাউসি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলী শাহকে মেটৈয়াব্রুজে নির্বাসিত করেন। তিনি বাংলায় ঠুমরীর প্রচার শুরু করেন। তার সভায় ১০০ জন সভা-গায়ক ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই ঠুমরী চর্চা করতেন। নবাব সাহেব শুধু সংগীত প্রেমিক নন, বহু নাট্যগীতি, কাব্যগীতি রচনা করে তিনি ঠুমরী নামে প্রচার করেন। তার জ্ঞাতি-ভ্রাতা মীর্জা আলী কদর তাঁকে এই রচনায় সাহায্য করতেন। তাঁর রচিত গানগুলোতে 'কদরপিয়া' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন তিনি। দ্রুত ঠুমরীও অনুরূপভাবে গীত হয়ে থাকে। ঠুমরী পরিবেশনার একটি বিশেষ নাটকীয়তা আছে, দৃশ্যপট আছে, রস, ভাব, বাচ্য, ভঙ্গিমা আছে, মত্ত-উল্লাস আছে, এইসব দিকগুলো বিবেচনায় রেখেই ঠুমরী তার আপন মহিমায় মহিমান্বিত।

ঠুমরী প্রসঙ্গে নানান জনশ্রুতি আছে, যেমন :

গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর। তিনি ধ্রুপদ গায়ক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শোনা যায় তিনি একদিন ভৈরবী রাগ গাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত বিবাদী স্বর প্রযুক্ত হয়ে গেলে তা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লাগে, এরপর তিনি তাতে আরো কিছু অনিয়মিত স্বর ভৈরবীতে প্রয়োগ করেন এবং রাগের রঞ্জকতা বৃদ্ধি করে এক অভিনব ধারার সৃষ্টি করে নিজের নামানুসারে 'তোমর' থেকে 'তোমরী' নামকরণ করেন পরে তা উচ্চারণগত কারণে 'ঠুমরী' নামে আত্মপ্রকাশ করে।

ইতিহাসসূত্রে জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর সংগীত-ইতিহাসের এক সংকটময় সময় রূপে চিহ্নিত। একদিকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনাভাস অপরদিকে ব্রিটিশদের

আধিপত্য বিস্তার। তখন নবাবদের মধ্যে বিলাসিতার প্রকোপ বেড়ে যায়। তারা মদিরা, সাকী, নৃত্য-গীতি, দাবা-পাশা ইত্যাদি নিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। খেয়াল গানে তাদের তৃপ্তি হতো না। কেননা তা লঘুরস সৃষ্টির পরিপন্থী ছিল না। আর খেয়ালের সাথে নৃত্য পরিবেশনযোগ্য ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদেই নৃত্য-সম্মিলিত চটুল রসাত্মক মনোরঞ্জক নৃত্য বা অঙ্গ-ভঙ্গিমার সাথে গীত প্রথার প্রচলন হয়, উন্মেষ ঘটে নৃত্যগীতে পটীয়সী নর্তকী দ্বারা পরিবেশিত চটুল গানের ধারা। এই নর্তকীদের বলা হতো 'বাঈজী'। 'বাঈ' শব্দের অর্থ সংগীতজীবী মহিলা। পরে 'বাঈ' শব্দের সঙ্গে সম্ভ্রমসূচক 'জী' যুক্ত করে 'বাঈজী' কথাটি প্রচলিত হয়ে ওঠে। বাঈজীরাই নৃত্য বা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি ও অভিনয়ের মাধ্যমে গাইতো, যা ঠুমরী নামে পরিচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বাঈজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। মূলত বাঈজীরাই ঠুমরী চর্চা করতো।

ঠুমরীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ঠুমরী মূলত কোমল প্রকৃতির। সাধারণত এতে নারীর মনোগত ভাব, যেমন মিলন, বিরহ, বিরাগ, অনুরাগ, পূর্বরাগ, বিচ্ছেদ, পুনর্মিলন ইত্যাদি ব্যক্ত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে, ঠুমরী গানের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল নারীর পক্ষ থেকে ব্যক্ত হয় – পুরুষের তরফ থেকে ব্যক্ত করতে সচরাচর দেখা যায় না; এটি এক পক্ষীয় বিষয়ও বলা যায়। এমনকি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও নারীর ঐশ্বরিক প্রেমকথা আপন আরাধ্য দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। সে ক্ষেত্রে নারীকে শ্রীরাধা এবং পুরুষ বলতে শ্রীকৃষ্ণকে মানা হয়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণকে শ্যাম, কাহ্নাই, কাহ্নু, মোহন প্রভৃতি নামে সম্বোধন করা হয়ে থাকে। ঠুমরী ধ্রুপদ বা খেয়াল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ধ্রুপদ মূলত পুরুষবাচক ও বীরত্বব্যঞ্জক হয়ে থাকে যা ঠুমরীতে অনুপস্থিত থাকে। ধ্রুপদের ভাব-গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বিষয়টি ঠুমরীতে নেই বললেই চলে। ঠুমরী কোমল, সংবেদনশীল স্বভাবের। শৃঙ্গার, করুণ ও ভক্তি ইত্যাদি রসাত্মক রাগগুলিই ঠুমরীর পক্ষে অধিকতর শ্রেয়। সচরাচর ঠুমরীতে ধুন জাতীয় রাগ (কোমল গা ও নি যুক্ত) অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন : ভৈরবী, কাফী, পিলু, খাম্বাজ, তিলং, ঝিঁঝিট, গারা, দেশ, সিন্ধু, ধানী ও তিলক-কামোদ ইত্যাদি। ক্ষেত্রবিশেষে আরো কয়েকটি, যেমন : বাগেশ্রী, বেহাগ, সোহেনী, কানাড়া, খাম্বাবতী, সুহা, মান্দ, পাহাড়ি, যোগিয়া, জংলা ও কালিংড়া ইত্যাদি রাগে গীত হয়ে থাকে।

ঠুমরীতে তুলনামূলকভাবে হালকা প্রকৃতির তাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা ছন্দোময় ও চটুল। বিলম্বিত লয়ের কিছু ঠুমরীতে যৎ, দীপচন্দী, আদ্ধা, পাঞ্জাবি তাল ব্যবহৃত হয়, অপর দিকে মধ্য ও দ্রুত লয়ের ঠুমরীতে ত্রিতাল, সিতারখানী, কাহারবা, দাদরা তাল প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ধ্রুপদ বা খেয়াল যে রাগে গাওয়া হয়; নির্দিষ্ট সেই-সেই রাগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হয়, কিন্তু ঠুমরীতে রয়েছে অবাধ বিচরণ; তা আপন বিকাশের স্বার্থে নির্দিষ্ট রাগের বাইরে চলাফেরা করতে পারে। তবে তা মোটেও স্বেচ্ছাচারিতা নয়; দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাগের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ঠুমরী হয়ে ওঠে রসাত্মক ব্যঞ্জনার আধার, যা মানুষের মনকে আবেগে ভরিয়ে তুলে।

ঠুমরীতে ধ্রুপদের লয় বিস্তার, খেয়ালের স্বর বিস্তার, টপ্পার তান বিস্তার ইত্যাদি থাকে না। এতে থাকে শব্দ-সৌন্দর্য ও শব্দের দ্বারা স্বর-সৌন্দর্য। এতে শব্দের তথা ভাষার মধ্যে নিহিত ভাবার্থের সহজ প্রকাশকে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। তাই ঠুমরী অধিক বোধগম্য ও বহুল জনপ্রিয়। তাই ঠুমরীকে লঘু উচ্চাঙ্গ-সংগীতের (Light Classical Music) পর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ঠুমরীকে দুভাবে বিভক্ত করা হয়েছে : ক) বিলম্বিত ঠুমরী ও খ) দ্রুত ঠুমরী। বিলম্বিত ঠুমরীকে মোটামুটি চারটি অংশে ভাগ করা যায় :

১. ছেড় : মূল গানটি ধরবার পূর্বে সেই রাগের আওচার, পকড় কিংবা চলন জাতীয় কিছু স্বরবিন্যাস গাওয়া অর্থাৎ আলোচ্য রাগের সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়াকে ছেড় বলা হয়।

২. বিস্তার : বোল ও স্বরের বিভিন্ন সংযোগ দ্বারা শব্দের অন্তর্নিহিত ভাবনা তথা কাব্যাত্মক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে শব্দচিত্র সুরের মাধ্যমে প্রদর্শন করা এবং তাকে আরো সুস্পষ্ট করার জন্যে ছোট ছোট কারুকার্য মুড়কি, খটকা ইত্যাদি প্রয়োগ করে পরিবেশন করাকে বিস্তার বলে।

৩. ফুটকর : এটি বিস্তারের মতোই, তবে ক্রমেই অন্তরার দিকে উঠে আসার পর্যায়ে বিস্তার করে দুএক বার অন্তরা পরিবেশন করাকে ফুটকর বলা হয়ে থাকে।

৪. উঠান : ঠুমরীর চতুর্থাংশ এবং সর্বশেষ পরিবেশনা। এ অংশে তালের গতি উত্তোলন বা বাড়ানো হয় বলে তাকে উঠান বলে। কেহ কেহ মাতনও বলে থাকে। অন্তরা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গেই উঠান আসে। দ্বিগুণ বা দুন লয়ে তবলা বাদিত হয়। শিল্পী তখন লঘু ছন্দের বোল-বাণীর লয়কারী করতে শুরু করেন। এই অংশে যৎ দিয়ে শুরু হয়ে ত্রিতাল বাদিত হয়ে শেষাংশে কাহারবায় লগ্গী, লড়ি, ছেপকা, পেশকার ইত্যাদি বাজানো হয়। এর দ্বারা গানের মাধুর্য ও সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে আবার বিলম্বিত লয়ে মুখরা গেয়ে শেষ করা হয়।

ঠুমরী পরিবেশনার জন্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় :

১. ঠুমরী পরিবেশনার জন্য কণ্ঠ বিশেষভাবে সুরেলা, নম্র ও কমনীয় হওয়া প্রয়োজন।

২. প্রতিটি গানের কাব্যভাব ও রসবোধ উপলব্ধির ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

৩. চর্চিত (তৈরি) কণ্ঠ থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক স্থূল, সূক্ষ্ম অলংকারাদি প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন।

৪. গানের ভাবার্থ অনুযায়ী বাণীকে খণ্ডিত করে গাওয়ার ক্ষমতা থাকতে হবে।

৫. রাগের জ্ঞান, মূল রাগের কাছাকাছি রাগ বা সমপ্রকৃতির রাগ ব্যবহারের ক্ষমতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৬. তাল ও ছন্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

৭. ধ্রুপদ, খেয়াল ও ঠুমরীর অলংকার সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

৮. ঠুমরীতে ভাষাগত দিক, যেমন উচ্চারণ, ভাষা প্রক্ষেপণ যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখা একান্ত প্রয়োজন।

৯. সুদক্ষ সদ্‌গুরুর সাহচর্য ও শিক্ষাদানই ঠুমরীর একমাত্র অবলম্বন এবং সর্বোত্তম বলে বিবেচিত।

এবারে আসা যাক কাজী নজরুলের ঠুমরী গান প্রসঙ্গে। ইতঃপূর্বে ঠুমরীকে চার অংশে বিভক্ত করে যে বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে তার সঙ্গে নজরুলের গানের সামুজ্য সুস্পষ্ট। অর্থাৎ তার ঠুমরী অঙ্গের গানগুলোয় শিল্পী স্বাচ্ছন্দ্যে ছেড়, বিস্তার, ফুটকর এবং উঠানের ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর ঠুমরী অঙ্গের গানগুলো ঠুমরীর সুর-সৌকুমার্য বা কাব্যিকমূল্য বিশ্লেষণে এক অনবদ্য সৃষ্টি। ঠুমরীর আবেদন শৃঙ্গার ও করুণ রসের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়, সেই নিরিখে কাজী নজরুলের ঠুমরী গান এক অনবদ্য সৃষ্টি। শাস্ত্রীয় সংগীতের চারটি ধারা – ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী। এই প্রত্যেকটি শাখা কাজী নজরুলের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিসম্ভারে পরিপূর্ণ। তবে তার সৃষ্ট গানে ঠুমরীর পরিধি অনেক বিস্তৃত।

ঠুমরীর সুরের মাধুর্য যে অপরিসীম ও সর্বজনগ্রাহ্য তারই প্রমাণ পাওয়া যায় কাজী নজরুলের গানে ঠুমরীর ব্যবহারে। নজরুল-সংগীতের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে ঠুমরী আঙ্গিকের গানে। নজরুলের রাগ সংগীতের প্রতি নিগূঢ় আকর্ষণ এবং কাব্যশক্তি এই দুইয়ের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে তাঁর ঠুমরী অঙ্গের গান। তাঁর রচিত এক অন্তরা বিশিষ্ট কিছু ঠুমরী বন্দিশ আকারে পাওয়া যায়, যাকে বাংলায় পূর্ণাঙ্গ ঠুমরী বন্দিশ বলা যায়। যেমন :

স্থায়ী : পরাণ প্রিয়! কেন এলে অবেলায়
শীতল হিমেল বায়ে ফুল ঝ'রে যায় ॥

অন্তরা : সেদিনো সকাল বেলা খেলেছি কুসুম খেলা
আজি যে কাঁদি একেলা ভাঙ্গা এ মেলায় ॥

এক অন্তরা বিশিষ্ট এই গানটি পিলু রাগে নিবদ্ধ, দাদরা তালে আবদ্ধ একটি পরিপূর্ণ বাংলা ঠুমরী। ঠুমরীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন : কাব্য বা বাণীর ভাবার্থ অর্থাৎ এর বাণী শৃঙ্গার ও করুণ রসাত্মক হয়। গায়নশৈলী অর্থাৎ এর বিস্তার অংশ আবেগময় এবং অর্থবহ বাক্য আকারে পরিবেশন করা হয় 'আ' কার যোগে খুব কম বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। তাল, লয় বা ছন্দ প্রয়োগের বিষয়টিতে এর আপন ধারা বিদ্যমান। এতে এমন একটি লয় নেয়া হয় যাতে বাণী-বিস্তার করতে সুবিধে হয় এবং ভাবপ্রকাশ সহজ ও সাবলীল থাকে।

গীতাঙ্গের পদ বা তুক সাধারণত এক অন্তরা বিশিষ্ট হয়ে থাকে, কখনো কখনো দুই অন্তরারও হয়, তবে সংখ্যায় খুব কম। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো নজরুলের ঠুমরীতে যথাযথভাবে পাওয়া যায়। যে গানের পদ বা তুক্ বেশি অর্থাৎ দুই বা তিনটি অথবা সঞ্চারীযুক্ত তাকে ঠুমরী অঙ্গের গান বলাই সমীচীন। কাজী নজরুলের গানে এর নমুনা পাওয়া যায় বহু গানে। তার যেমন পূর্ণাঙ্গ বাংলা ঠুমরী আছে তেমনি ঠুমরী অঙ্গের গানও রয়েছে প্রচুর।

তাঁর রচিত আরো একটি বাংলা ঠুমরী (এক অন্তরা বিশিষ্ট) :

রাগ : খাম্বাজ। তাল : যৎ।

স্থায়ী : পেয়ে কেন নাহি পাই হৃদয়ে মম
হে চির সুদূর প্রিয়তম ॥

অন্তরা : তুমি আকাশের চাঁদ
(আমি) পাতিয়া সরসী ফাঁদ
জনম জনম কাঁদি কুমুদীর সম
হে চির সুদূর প্রিয়তম
(আমি) কুলের কুলের রাধা ॥

গানটি কাঠামোগত দিক দিয়ে, করুণ-শৃঙ্গার রসাত্মবোধে এবং যৎ তাল-লয়ের ব্যবহারে একটি পরিপূর্ণ বাংলা ঠুমরীর দাবি রাখে। কারণ গানটিতে নারীর আকুল কণ্ঠে করুণ আর্তি ব্যক্ত হয়েছে। প্রিয়তমকে পেয়েও না পাওয়ার যে বেদনা তা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে খাম্বাজ রাগের মাধ্যমে। অন্তরার শেষে যে 'আমি ফুলের রাধা' সম্বোধন, তা ঠুমরীর আপন বৈশিষ্ট্য।

নজরুলের ঠুমরী অঙ্গের আর একটি অনবদ্য গান :

'সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি
আমারে ছুঁইয়াছিলে

অনুরাগ কুমকুম দিলে দেহে মনে

বুকে প্রেম কেন নাহি দিলে ॥

পিলুরাগে রচিত এ গানটি সঞ্চারী সম্মিলিত গান যাতে ঠুমরীর সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। গানটিতে ভাবরসের সঙ্গে করুণ রসের এক অসাধারণ মিশ্রণ ঘটেছে। গানটি বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় খুব সহঝেই বোঝা যায় যে, এতে আলাদা করে বিস্তারের আর কোনো প্রয়োজন নেই – নজরুল তার সঞ্চারী সমেত গানে নানা সুরের মিশ্রণ দেখিয়ে গানটিকে ভরিয়ে তুলেছেন – আলাদা করে বিস্তারের কোনো অবকাশ নেই বললেই চলে। যেমন অস্থায়ীতেই 'অনুরাগ' শব্দটিতে তিনি 'স রম রম' আসাবরী মিশ্রণ ঘটিয়ে বৈচিত্র্যময় করেছেন। এর পরপরই ফিরে আসেন পিলু রাগে। আবার 'তোমারে বুঝি গো' অংশে 'স র ম প' পিলু থেকে সরে গিয়ে আসাবরীর' রূপ নেয়। এমনিভাবে কাজী নজরুল একই গানে কখনো কখনো ৪/৫টি রাগের মিশ্রণও দেখিয়েছেন। যেমন এই গানেতে ভৈরবী, আশাবরী ও পিলুর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এই গানের শেষে 'প্রিয়তম' শব্দটি মাত্র একটি বার ব্যবহার করে গানটিকে ঠুমরী বিশিষ্টতায় নিয়ে গেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে ঠুমরীর জাতক হলো স্ত্রৈণ বাচক; অর্থাৎ এতে প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার প্রেম নিবেদন, বিরহ প্রকাশ, না পাওয়ার অভিমানই অভিব্যক্ত হয়।

কবি নজরুলের নারায়ণী রাগে সৃষ্ট ঠুমরী অঙ্গের আর একটি অসাধারণ গান, আদ্ধা তালে নিবদ্ধ গানটির বাণী :

'রহি রহি কেন সে মুখ পড়ে মনে

ফিরায়ে দিয়াছি যারে অনাদরে অকারণে,

গানটিতে বাণী ও সুরের এক অপূর্ব দৃশ্যপট ফুটে উঠেছে। প্রথমে নারায়ণী রগের পরিচিতি দেখা যাক:

| | | |
|---|---|---|
| আরোহী | – | সা রা মা পা ধা র্সা, |
| অবরোহী | – | র্সা র্ণা ধা পা মা রে সা |
| বাদী | – | ষডড় (মতান্তরে পঞ্চম) |
| সমবাদী | – | পঞ্চম (মতান্তরে ষড়জ) |
| সময় | – | সকল সময় (মতান্তরে রাত্রি ২য় প্রহর) |
| প্রকৃতি | – | শান্ত |
| পকড় | – | রম প, ণ ধ ম প ণ ধ- প, ম রে ম রে- সা, |
| ন্যাসস্বর | – | স রে প |

এই রাগ সম্পর্কে দেবব্রত দত্ত বলেন :

'নারায়ণী রাগটি উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত হলেও মূলত দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীত থেকে নীত। আলোচ্য রাগটিতে দক্ষিণ ভারতীয় 'হরিকাম্ভোজী' মেলের অন্তর্গত বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য বর্তমানে উত্তরী ও দক্ষিণী পদ্ধতির পরস্পর আদান-প্রদানে ভারতীয় সংগীত এক বিশেষ আসনে আসীন। নারায়ণী রাগটি উত্তরী পদ্ধতিতে প্রচলিত কয়েকটি রাগের মিশ্রণে সৃষ্ট বললে অত্যুক্তি হয় না। যথা- সারাং, দুর্গা, সুরট, সুরদাসী মল্লার, গোরখ কল্যাণ ইত্যাদি রাগের স্বরূপে ভাস্বর (দেবব্রত, ২০১০ : ১২৪)।'

শাস্ত্রীয় মতে নারায়ণী রাগে কোমল গান্ধার নেই কিন্তু কাজী নজরুল এই গানটিতে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে কোমল গান্ধার ব্যবহার করেছেন। আলাপাংশে 'সরা ম পা ধাঃ সাৃণঃ' স্বরবিন্যাস এসেছে। গানের অংশে *'রহি'র* অংশের স্বরবিন্যাস পাওয়া যায় 'রঙ্গরসনা' এভাবে স্থায়ীতে তিনি দুবার কোমল গান্ধার ব্যবহার করলেও নারায়ণী রাগের চলনেই সীমাবদ্ধ ছিলেন। এ ছাড়া সঞ্চারী বা আভোগেও অন্য কোন রাগের আভাস পাওয়া যায়নি। ঠুমরী গানের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে অন্য রাগের মিলন ঘটানো। অর্থাৎ আবির্ভাব ও তিরোভাবের খেলা দেখানো। নারায়ণী খুব প্রচলিত রাগ নয় বলে গানটি অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় ভরে উঠেছে। গানটিতে ঠুমরীর সকল বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত।

ঠুমরী অঙ্গের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গান যা চির অম্লান হয়ে থাকবে চিরকাল। যেমন :

১. এ কোন মায়ায় ফেলিলে আমায়
   রাগ : শিবরঞ্জনী-ভৈরবী। তাল : দাদরা

২. রহি রহি কেন সে মুখ পড়ে মনে
   রাগ : নারায়ণী। তাল : ত্রিতাল

৩. পরাণ প্রিয়! কেন এলে অবেলায়
   রাগ : পিলু। তাল : দাদরা

৪. বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ
   রাগ : পিলু-ভৈরবী। তাল : দাদরা

৫. সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি
   রাগ : পিলু। তাল : দাদরা

৬. পিয়া গেছে কবে পরদেশ
   রাগ : পাহাড়ী। তাল : কাহারবা

৭. কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া
   রাগ : খাম্বাজ। তাল : ত্রিতাল

৮. বনে চলে বনমালী বনমালা দুলায়ে

রাগ : কাফী । তাল : কাহারবা

৯. না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়

রাগ : ভৈরবী । তাল : কাহারবা

১০. পরদেশী বঁধু ঘুম ভাঙায়ো চুমি আঁখি

রাগ : মান্দ । তাল : কাহারবা

১১. সখী আর অভিমান জানাব না

রাগ : ভৈরবী । তাল : কাহারবা

১২. কোন যমুনার কূলে

রাগ : ভৈরবী

১৩. আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী

রাগ : খাম্বাজ-পিলু । তাল: দাদরা

১৪. অচেনা সুরে অজানা পথিক

রাগ: পিলু । তাল: কাহারবা

১৫. স্বপনে এসো নিরজনে (প্রিয়া)

রাগ : পিলু । তাল : দাদরা

১৬. সখী আর অভিমান জানাবো না

রাগ : ভৈরবী । তাল : কাহারবা

কাজী নজরুল ইসলামের এরূপ অজস্র গান আছে যে গানগুলোতে ঠুমরীর গীতশৈলী বিদ্যমান। ঠুমরীর সকল বৈশিষ্ট্য তিনি তাঁর গানে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বকীয়তা দিয়ে। কাজী নজরুল তাঁর গানে ঠুমরীর ধারাকে ব্যবহার করে বাংলা গানকে করে তুলেছেন ঋদ্ধ ও আকর্ষণীয়।

## গ্রন্থপঞ্জি

ইদ্রীস আলী (১৯৯৭)। *নজরুল সংগীতের সুর*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমণ্ডি, ঢাকা

দেবব্রত দত্ত (২০১০)। *ক্রিয়াত্মক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে রাগ-রূপায়ণ*। ব্রতী প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস (১৪০২)। *ঠুমরী লহরী* (প্রথম খণ্ড), দীপায়ন, ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলিকাতা

ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (২০০৯)। *নজরুল সংগীত নির্দেশিকা*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমণ্ডি, ঢাকা

রশিদুন নবী সম্পা. (২০০৬)। *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমণ্ডি, ঢাকা

লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ (১৯৭৫)। *গীতবাদ্যম্*। Firma K. L Mukhopadhya Publishers an Distribulors, 257 B, Bipin Bihari Ganguly Stret, Calcuta-12

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (১৯৯৯)। *'রাগ ও রূপ'* স্বামী বিবেকানন্দ, ২য় ভাগ, ১৯ এ এবং বি রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা

সুকুমার রায় (১৯৮৮)। *ভারতীয় সঙ্গীত : ইতিহাস ও পদ্ধতি*, এম. প্রা. লি., কলকাতা